International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক দিলীপকুমার রায় : ইউরোপের পটভূমিতে বাংলা উপন্যাস

বাণী রায়[১], সুমিতা চক্রবর্তী[২]

[১]গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি
[২]তত্ত্বাবধায়ক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ (Abstract):
বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক অর্থাৎ ১৯৩০-১৯৩৯-এর মধ্যে বহু বিচিত্র ধরনের বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছিল। একটি ধারায় বিদেশের পটভূমিতে বাঙালির বসবাস ও অভিজ্ঞতা ছিল উপন্যাসের বিষয়। এই বিষয় নিয়ে এর আগে বাংলা উপন্যাস লেখা হয়নি। এই ধারার বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়। তাঁর রচিত দুটি প্রধান উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সমকালীন বাঙালি সমাজের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ (Key Words) : ইউরোপ, বঙ্গীয় সমাজ, বিদেশ যাত্রা, নর-নারী সম্পর্ক, ইউরোপীয় সমাজ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি।

সম্পূর্ণ গবেষণাপত্র :

উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন। উপন্যাসের প্রকৃতি অনুসারে কখনো তা সামাজিক জীবন, কখনো রাজনৈতিক জীবন, কখনো বা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা। মানুষের সমাজ বিবর্তনশীল। সমাজের এই বিবর্তনশীলতার সঙ্গে উপন্যাসের সংযোগ নিবিড়। সমাজের পরিবর্তন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনে, অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন আসে। নতুন সময়ের উপন্যাসে উঠে আসে সেই সব নতুন অভিজ্ঞতার দৃশ্য ও আখ্যান।

ভারতবাসীর জীবনে পাশ্চাত্য দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতার আছে একটি ধারাবাহিকতা। একদা উনিশ শতকে সমুদ্র অতিক্রম করে বিদেশ যাত্রা হিন্দু ভারতীয়দের কাছে ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনও বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে খুব বেশি আসত না কারণ, কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে ভূ-সম্পত্তি নির্ভর পরিবারের পুরুষেরা যদি স্বভূমিতেই থাকে তাহলেই তারা নিশ্চিন্ত ও সম্পন্ন থাকতে পারে। এই জন্যই তখন বিদেশ যাত্রাকে সমর্থন করা হত না।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কালে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে যে বহুমুখী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি হল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে মেধাবী বাঙালি যুবকেরা এক বুদ্ধিজীবী সমাজ গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন, যেখানে জীবনের সাফল্য কৃষিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে লগ্ন নয়। যাদের সেই আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল তারা সন্তানদের চিকিৎসাবিদ্যা, আইনবিদ্যা, অন্যান্য কারিগরি বিদ্যা এবং সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য সন্তানদের বিদেশে পাঠাতে শুরু করলেন। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রধানত ইংল্যান্ডই ছিল এই সমুদ্রপারের দেশ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুল বসু। এছাড়াও গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলেরই লেখায় প্রধানত চিঠিপত্র, দিনলিপি এবং স্মৃতিকথায় ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডবাসীর অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' (প্রথম — ১৮৯১, দ্বিতীয় — ১৮৯৩)। এঁদের মধ্যে ছোটোগল্পে এই অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকার জীবনচিত্র নিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস লেখা হল প্রথম বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। দুই প্রধান লেখক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় এবং দিলীপকুমার রায়। বর্তমান নিবন্ধে দিলীপকুমারের উপন্যাসে তাঁর ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি পর্যালোচিত হয়েছে।

প্রথমে দিলীপকুমার রায়ের জীবন সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রয়াণ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের বিখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। নাটক, কবিতা ও সংগীত ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান সাংস্কৃতিক বিচরণের ক্ষেত্র। তাঁর পুত্র দিলীপকুমার সাহিত্য ও সংগীতের চর্চা করেছেন বিশেষভাবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পাস করার পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড-এর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু-র পরিচয় হয়েছিল। পরবর্তীকালেও সেই বন্ধুত্ব ছিল অক্ষুণ্ণ। বিদেশে থাকাকালীন তিনি সাহিত্য ও

সংগীতচর্চার পাশাপাশি ফরাসি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষাও শিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রোমাঁ রল্যাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, হারমান হেসে প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদদের। প্রথমবার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এলেও তিনি আবার ইউরোপ গিয়েছিলেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে, বিশেষভাবে সংগীত সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য।

বাংলা সাহিত্যে লেখক রূপে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী দিলীপকুমার রায় পরিণত বয়সে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঋষি অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পণ্ডিচেরিতে বসবাস করেন। একটা সময় পন্ডিচেরি আশ্রমে বসবাসের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলে এক মারোয়ারি বন্ধুর আমন্ত্রণে পুণাতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ক্রমে এই বাসগৃহ কৃষ্ণমন্দিরে পরিণত হয়। সেখানে শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একত্রে জীবনযাপন করছিলেন। তিনি বহুবার বিদেশে গেছেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতার সংস্কৃত আকাডেমি কর্তৃক দিলীপকুমার 'সুরসুধাকর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংগীত-নাটক আকাডেমির ফেলোশিপ সম্মান লাভ করেন। অবশেষে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।[১]

বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত হবে দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির প্রতিফলন। তিনি লিখেছেন প্রধানত কবিতা, উপন্যাস এবং স্মৃতিকথা। তাঁর রচিত 'অগামী' (১৯৩৩) এবং 'সূর্যমুখী' (১৯৩৬) দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতাগুলি মূলত ভক্তিভাবের সাক্ষ্য বহনকারী এবং অনেকটাই প্রাচীনপন্থী। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল — 'মনের পরশ' (১৯২৬), 'রঙের পরশ' (১৯৩৪), 'দোলা' (১৯৩৫), 'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা' (১৯৩৫)। এছাড়াও তিনি কতকগুলি ভ্রমণকাহিনি রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা' (১৯২৬)। ১৯২২ সালে বিদেশ থেকে ফিরে এসে সুরের সন্ধানে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন লেখক। সেই অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে এই বইটিতে। এছাড়াও তিনি রচনা করেন 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' (১৯৪০) এবং 'দেশে দেশে চলি উড়ে' (১৯৫৮) নামক দুটি ভ্রমণকাহিনি। তিনি ইংরেজিতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং একাধিক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন। তাঁর লেখা ইংরেজি গ্রন্থগুলি হল — 'অ্যামাং দ্য গ্রেটস্' (Among the Greats) ও 'তীর্থঙ্কর'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের সুমতি'-র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন দিলীপকুমার। তাঁর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল — 'অঘটনের শোভাযাত্রা', 'আমার বন্ধু সুভাষ', 'আশ্চর্য', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল', 'গীতমঞ্জরী', 'গীতসাগর', 'ছায়ার আলো', 'তরঙ্গ রোধিবে কে' প্রভৃতি।

আমরা প্রধানত আলোচনা করব তাঁর রচিত দুটি প্রধান উপন্যাস — 'রঙের পরশ' এবং 'দোলা'। দিলীপকুমার রায়ের লেখা 'রঙের পরশ' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছেন শ্রীমান স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়কে। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক প্রথমেই বলেছেন — "এই উপন্যাসটি লিখেছিলাম যৌবনে, কাজেই যৌবনসুলভ বহু উচ্ছ্বাস অত্যুক্তি আছে। কিন্তু সেসব বাদ দিলে সত্যকথন হবে না। লেখাটি অনেকের ভালো লেগেছিল ইনটেলেকচুয়াল হওয়া সত্ত্বেও এবং এ নিয়ে তুমুল কাণ্ড হয়··· স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গল্পে বুদ্ধির প্রবেশকে Persona non grata বলে খেদিয়ে দিতে চাওয়ায় অনেকেই রুখে উঠেছিলেন। আমার ভাগ্যবশে শরৎচন্দ্র হলেন আমার দিকে। ফলে তর্ক-বিতর্ক ফেনিয়ে উঠেছিল। আজ সে-সব ফেনা কেটে গেছে — আছে গল্পটির প্রাণগত তথা মনোগত (ইনটেলেকচুয়াল?) রস। হোক, রস থাকলেই হল — অর্থাৎ পড়তে ভালো লাগলেই বই মঞ্জুর — ইনটেলেকচুয়াল হোক বা না হোক।"[২]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপকুমারের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট স্নেহের ও শ্রদ্ধার। দিলীপকুমার তাঁর উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই পত্রটি 'সাহিত্যের মাত্রা' নামে প্রবন্ধ রূপে 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত। সেই চিঠির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল — "পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেচে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইনটেলেক্‌চুয়েল কসরতের কাজে লেগেচে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়কর রূপে ইনটেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজনসাধকও হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান নয়।"[৩]

প্রথমে 'রঙের পরশ' উপন্যাসের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে উপস্থাপিত হল। বাঙালি যুবক রাজ্যেশ্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সস্ত্রীক লন্ডন-এ এসেছে গবেষণার কাজে। রাজ্যেশ্বরের একদা ছাত্র অতনু অনেকটা তার বন্ধুর মতোই। সে ধনী সন্তান এবং ইউরোপে ভ্রমণ করে বেড়ায়। রাজ্যেশ্বর, অতনুকে তার কাছে ডেকে নিয়েছে। এবং তারা তিনজন রোমে একটি ফ্ল্যাট-এ বসবাস করছে। রাজ্যেশ্বর গবেষণার কাজে ব্যস্ত, তাই অতনুকেই ভার দিয়েছে দীপাকে ইউরোপ ঘুরিয়ে আনবার। এখানে একটু প্রশ্ন জাগে, অতনুর সঙ্গে এক সময় দীপার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। দীপার প্রতি দুর্বলতা ছিল বলে আর সে বিবাহ করেনি। রাজ্যেশ্বর সব জেনেও অতনু-র সঙ্গেই দীপাকে ভ্রমণে পাঠাতে চায়। রাজ্যেশ্বর কেন এমন করল তার কোনও ব্যাখ্যা উপন্যাসে নেই। এই সূত্রেই সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আছে উপন্যাসে। আবার অতনু দীপাকে শুনিয়েছে তার প্রণয়িনী রুভা-র কথা। রুভা, আধা-সার্বিয়ান, আধা-জার্মানি। আবার তারই মধ্যে লরা নামে একটি মেয়ে উপস্থিত হয়, যে ছিল রুভা-র বান্ধবী। লরা-র সঙ্গেও অতনু-র মনের বন্ধন গড়ে ওঠে। স্পষ্টতই এখানে ঘটনার বিন্যাস অত্যন্ত দুর্বল। দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে একজন নারীর সঙ্গে অনেক পুরুষের ঘনিষ্ঠতা এবং একজন পুরুষের সঙ্গে অনেক নারীর ঘনিষ্ঠতা — এরকম ঘটনাবিন্যাস প্রায়ই দেখা যায়। এজন্য তিনি কোনও কারণও নির্দেশ করেননি এবং কৈফিয়ৎও দেননি।

উপন্যাসে দেখা যায়, লরা এবং রুভা দুজনের প্রতিই অতনু-র আকর্ষণ। দীপা তখন চলে গেছে অনেক নেপথ্যে। নারী ও পুরুষের প্রেমজ সম্পর্ককে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন দিলীপকুমার। তাঁর উপন্যাসের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। লেখক নিজেও নারী চরিত্রের বিশিষ্টতা তুলে ধরতে বেশ আগ্রহী। লেখকের বর্ণনায়

— "লরা, রুভা-র মতো যাকে বলে 'প্যাশনেট' — উদ্দাম — মেয়ে ছিল না। রুভা ছিল যেন দমকা হাওয়া; লরা বসন্তের অতি শীতল মলয়াবিল মন্দ মন্দ বহনা। রুভা-র তাল উচ্ছল, লরা-র ফল্গু। রুভা-র চাহনি হাসি সবই অতিমাত্রায় আত্মসচেতন — সেলফ্ কনশাস্; লরা-র আত্মভোলা। রুভা-র দীপ্তি বিদ্যুতের; লরা-র শুকতারার" (রঙের পরশ, পৃ. ৩৩৩)। এই অংশে আমরা রুভা-র সঙ্গে লরা-র পার্থক্যটি অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশিত হতে দেখি।

লরা-র স্বামী আগেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি লরা-র উপর অত্যাচার করতেন, তা সত্ত্বেও লরা তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করেনি। এরপর অতনু ও লরা-র বিবাহের কথা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে।

দিলীপকুমার দেখিয়েছেন যে, অতনু ও লরার প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করল কোনো শাস্ত্রীয় আচার এবং পুরোহিতের মন্ত্র ছাড়াই। এর প্রতিক্রিয়ায় কষ্টে ও অভিমানে রুভা শয্যা নিল। তখন অতনু তাকে দেখতেও এসেছে। রুভা সেরে ওঠার পর আর লরা-র নাম মুখে আনে না। অন্যদিকে অতনুও রুভার আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অতনুর মনের চেহারাটা এখানেই ফুটে ওঠে।

অতনু, লরা-কে নিজের মনের অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখল। লরা অনেক দিন পর তার উত্তর দিল। এবং তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী জীবনযাপনকে এক বছর পিছিয়ে দিল। এই শেষ পর্যায়ে আছে উপন্যাসের একটি মোচড়, যা দিলীপকুমারের উপন্যাসে প্রায়শই দেখা যায়। লরা, তার ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে অতনুর প্রতি ভালোবাসাকে অবিচ্ছিন্ন করে নিল। মানবীয় প্রেমকে ঈশ্বরীয় প্রেমের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়ার উপলব্ধি এবং সেই অনুসারে চরিত্রের বিবর্তন অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসেও দেখা যায়। লরা বলেছে — "তুমি জানো আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। তুমি জানো প্রেমেও আমি বিশ্বাস করি। সেইজন্যেই — কেননা ভগবানের রসমূর্তি প্রেমঘন বলেই আমি মানি — না, তার চেয়েও বেশি — জানি। অন্যভাবে বলতে গেলে বলব; প্রেমের ফুলেল রসবাণীই আমার হৃদয়ের তালে তালে ভগবানের ধ্যানমূর্তি জাগিয়ে তুলেছে। প্রেমের রঙেই আমি করেছি তার কল্পনা" (রঙের পরশ, পৃ. ৩৮৬)।

এরপরে উপন্যাস দ্রুত সমাপ্ত হয়। অতনু-র সঙ্গে লরা-র আর দেখা হয়নি। অতনু-র সঙ্গে রুভা-র সম্পর্কের কী পরিণতি হল তা-ও জানা যায় না। উপন্যাসের এই আলগা সূত্রটি লেখক যুক্ত করতে পারেননি। উপন্যাসের শেষে রাজ্যেশ্বর ঘটনাস্থলে চলে এসেছে এবং দীপাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কও শেষ পর্যন্ত অটুট থেকেছে।

বিদেশের পটভূমিতে রচিত দিলীপকুমার রায়ের 'দোলা' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ পত্রে শিশিরকুমার ঘোষকে ঔপন্যাসিক লিখেছিলেন — "দোলার দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অদলবদল করেছি। প্রধান সংস্কার এই যে, প্রথম সংস্করণে অনেক কথাই ফেনিয়ে বলার ফলে বক্তব্যের জোর ক'মে গিয়েছিল, এ সংস্করণে সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলেছি। এতে আশা করি ফেনাটুকুই বাদ গেছে, পানীয়ের পরিমাণ কমে নি।"[৪]

'দোলা' উপন্যাসটির আদ্যন্ত লিখনস্থল ইউরোপ। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন এই উপন্যাসটি লিখতে তাঁর সময় লেগেছিল মোট তিন সপ্তাহ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি লেখাটি শেষ করেন। 'উত্তরা'-য় লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে উপন্যাসটি পাঠক-সমাজে সমাদর পেয়েছে বলে তিনি বইটির পরিমার্জন করেছেন এবং অনেক কিছু বর্জন করেছেন।

দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আমরা দেখতে পাই। প্রথমত, তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরা সকলেই উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। তারা শিল্প ও সাহিত্যে আগ্রহী। কেউ কেউ দর্শন ভাবনাতেও নিজেকে মগ্ন করে রাখে। দ্বিতীয়ত, ভারত থেকে তারা পাড়ি দিয়েছে ইউরোপে। তাদের ইউরোপ-বাসের অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রধানত তাঁর উপন্যাস। তৃতীয়ত, তাঁর উপন্যাসে ভারতীয় বাঙালি এবং ইউরোপের মানুষেরাও চরিত্র রূপে পরিকল্পিত হয়। এই সূত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি তুলনাত্মক রূপ উঠে আসে তাঁর উপন্যাসে। চতুর্থত, তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় নরনারীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র। পঞ্চমত, তাঁর উপন্যাসে যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে প্লট নির্মিত হয় না। একদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান, দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা, অন্যদিকে চরিত্রগুলির রোমান্টিক ভাববহুল আত্মকথন ও সংলাপ — এই হল তাঁর উপন্যাসেরর প্রধান বিষয়। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই এই লক্ষণগুলি দেখা যাবে। 'দোলা'-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

সদ্য বিবাহিত জমিদারপুত্র স্বপন ছবি আঁকা শিখতে গেছে প্যারিস-এ। তার স্ত্রী অনুরোধ করেছিল প্রতি মেলে যেন স্বপন দীর্ঘ চিঠি লেখে। প্যারিস-এ গিয়ে সৌভাগ্যবশত এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হল। তিনি স্বপনকে তার শিষ্য করে নিলেন। স্বপনেরও প্রতিভা স্ফুরিত হতে লাগল।

'দোলা' উপন্যাসটি অনেকগুলি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের নাম 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। এই পর্বের একটি ঘটনা হল — স্বপন তার গুরুর গৃহে একদিন দেখতে পেল যে, এক নিরাবরণ মডেলকে সামনে রেখে তিনি ছবি আঁকছেন। এই দৃশ্য দেখে বিচলিত স্বপন পর্দার আড়ালে লুকোতে গিয়ে ঘরের টেবিল উলটে ফেলে। কিন্তু বস্তুত এই পরিস্থিতিতে ফরাসি চিত্রশিল্পী ও মডেল কারোরই বিচলিত হওয়ার কারণ ঘটেনি। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভ্যস্ত আচরণবিধির প্রথম সংঘাত।

এই বিষয়টি থেকেই স্বপনের মনের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন লেখক। ফরাসি গুরু মসিয়ে বেনার স্বপনের দ্বিধা লক্ষ করেন এবং তাকে শিল্পীর দৃষ্টিতে মডেলকে দেখবার বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু স্বপন স্ত্রী-র কথা মনে করে এই ধরনের ছবি আঁকতে স্বচ্ছন্দবোধ করছিল না। এই অংশে চিত্রশিল্পীর অনাসক্ত দৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কিছুটা আলোচনা আছে।

মডেল আনা-র সঙ্গে স্বপনের বন্ধুত্ব হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও আনাকে সামনে রেখে ছবি আঁকতে গিয়ে তার দেখা দেয় অন্য সমস্যা। অনেকক্ষণ মডেলকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় একই ভঙ্গিতে। সেজন্য তার কিছুটা শারীরিক কষ্টও হয়। এই চিন্তায় স্বপনের মনে দেখা দেয় করুণা। সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায় ছবি আঁকা। বোঝা যায় তখনও স্বপন শিল্পীর অনাসক্ত দৃষ্টি অর্জন করতে পারেনি।

উপন্যাসের আখ্যানে পরবর্তী পরিচ্ছেদটির নাম হল 'বাক্যের ঝড় তর্কের ঝুলি'। নাম থেকেই বোঝা যায় এই অংশে কেবল বাক্যালাপই থাকবে। আনা ও স্বপনের মধ্যে প্রেম নিয়েও অনেক কথার বিনিময় ঘটেছে। সেইসব কথোপকথনের মধ্যেও স্বপনের ভাবাবেগ ও আনা-র যুক্তিবাদের দিকটি ফুটে ওঠে।

উপন্যাসে স্বপন এবং আনা-র মূল কাহিনির পাশাপাশি আর একটি উপকাহিনি যুক্ত হয়েছে আনা, মরিস এবং নীরাকে ঘিরে। আনা-র স্বামী মরিস বঁপার ছিলেন একজন জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে একদিন আনা এই তরুণ কবির প্রতি আসক্ত হয়েছিল। ক্রমে তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রথম দিকে মরিস এবং আনা-র সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। কিন্তু তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করল নীরা নামে আনা-র এক বাল্যসখীকে কেন্দ্র করে।

স্বপন, আনা এবং মসিয়ে বেনারকে অবলম্বন করে উপন্যাসের প্লট আবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। মসিয়ে আত্মভোলা স্বভাবের মানুষ হলেও তিনি অসহায়ের সহমর্মী। তিনি আনা-কে আশ্রয় ও সম্মান দিয়েছেন। আনা-র মডেলের পেশাকে অনেকে খারাপ চোখে দেখলেও আনা নিজে এবং মসিয়ে বেনার এই কাজে অসম্মানের কিছু দেখেন না। এই স্থানে এসে বোঝা যায় বিশ শতকের তিরিশের দশকে ফ্রান্স-এও মডেলের পেশা নিয়া সমালোচনা করা হত। কিন্তু দিলীপকুমার রায়ের এই ধারণা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ফ্রান্স, বিশেষ করে প্যারিস সুদীর্ঘকাল থেকেই চিত্রশিল্পের জগতে অগ্রণী। রেঁনেসাস-এর কাল থেকেই নারী-মডেলকে নিয়ে প্রচুর ছবি সেখানে আঁকা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে মডেলের পেশা নিয়ে সেখানে এই ধরনের মানসিকতা ছিল বলে মনে হয় না। এই দ্বিধা ও প্রশ্ন সম্ভবত দিলীপকুমারের নিজের।

দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাস ঘটনা-সংস্থানের যৌক্তিকতার উপর নির্ভর করে না — তা আমরা আগেই দেখাছি। তাঁর উপন্যাস হল চিন্তন নির্ভর, তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল নয় কিন্তু চিন্তনেরও কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারা তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় না। তবে এটুকুই বলা যায় যে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে।

উপন্যাসের দুটি অংশ আছে 'আকস্মিক' এবং 'নীস'। 'আকস্মিক' অংশে আনা-র সঙ্গে স্বপনের সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা এবং 'নীস' অংশে স্থান পেয়েছে নীস অঞ্চলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ।

'নীস' পর্বে স্বপন অত্যন্ত সুন্দরী এবং ধনী বিপত্নীক পিতার কন্যা ইসাবেলাকে দেখতে পায়। তার সঙ্গে যুবকটি কুৎসিত দেখতে এবং চিনদেশীয়। সে চিত্রশিল্পী। ইসাবেলা বহু ধনী যুবকের পাণি-প্রার্থনা উপেক্ষা করে চাং-এর সঙ্গে চলে এসেছে।

ইসাবেলার বাবা আদালতে গেলেন। সেখানে বিচারক ইসাবেলাকে পিতার কাছে ফিরে যেতে বললে ইসাবেলা মায়ের গয়নাগুলি নিয়ে স্পেন ছেড়ে ফ্রান্স-এ চলে এসেছে। এই বিবরণে দুটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফ্রান্স-এর বিচারক প্রাপ্তবয়স্ক ইসাবেলাকে পিতার কাছেই ফিরে যেতে বলবেন এমন যেন ঠিক আশা করা যায় না। ফ্রান্স বরাবরই ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ।

দ্বিতীয়ত, চিনদেশীয় চাং-কে বারবার কুৎসিত বলে উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে এখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কাছে রুচি বিক্রি করে দেওয়া ভারতীয় মন ফুটে ওঠে। এই ভারতীয়দের কাছে ইউরোপীয় আদর্শের চেহারাই সুন্দর। আফ্রিকা, চিন, জাপান অঞ্চলের মানুষেরা তাদের চোখে অসুন্দর। দিলীপকুমার রায়কেও যখন আমরা দেখি যে, তাঁর উপন্যাসের নায়ককে তিনি এই মনোবৃত্তির অধিকারী রূপে দেখিয়েছেন তখন তা আমাদের মনকে কিছুটা ব্যাহত করে। কিন্তু তারপরেই যখন দেখি যে, চাং-এর হাসির সৌন্দর্য ও মিষ্টতা দেখে স্বপন মুগ্ধ হয়, এবং ধীরে ধীড়ে চাং-এর ভিতরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে, তখন আমরা বুঝতে পারি দৈহিক রূপ সম্পর্কে ভারতীয় মনের এই সংস্কারকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন তিনি।

এই 'নীস' অধ্যায়ে একটি স্থানীয় উৎসবের বর্ণনা আছে। এই উৎসবের নাম ফুল-যুদ্ধ (Bataille des Fleurs)। এই বর্ণনা অংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি। ফুলে ফুলে অপ্সরোসম বারাঙ্গনাদের ভিড় জমতে দেখা যায় রাস্তায়। বিভিন্ন রকম যানবাহনের শোভাযাত্রা। ফুল দিয়ে বানানো অতিকায় ঈগল, ফুলের তিমি মাছ, দেব, দানব ইত্যাদি সে এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে ঠেলাগাড়ি করে। অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করছে গলাগলি, নাচানাচি, হাসাহাসি — এসব কিছু স্বপনের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার করে। চাং-কেও এই নৃত্যে অংশ নিতে দেখা যায়। তার সঙ্গ নিয়েছে বেশ কিছু প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা এবং সুন্দরী ও অসুন্দরী মেয়ে। ইসাবেলা-র বেলাতেও তাই; লেখকের ভাষায় — "মৌমাছির গাঁদি লেগেছে ওর পিছনে। চাং ও ইসাবেলা যেন এ নৃত্য আসরের রবি-শশী। চাং-এর নৃত্যে আকৃষ্ট হয় সকলে। স্বপন আজ দেখেছে চাং-এর কতরকম নৃত্য — ওয়ালটজ, ট্যাঙ্গে, চার্লসটন, পোলকা — এইসব নৃত্য" (নীস)। চাং-এর নৃত্যকলার পারদর্শিতা মুগ্ধ করে দেয় স্বপনকে, সেই সঙ্গে সে যখন জানতে পারে ইসাবেলার পিতার বিপজ্জনক ক্রোধকে সে উপেক্ষা করছে এবং সাহসের সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইসাবেলাকে তখন তার প্রতি স্বপনের শ্রদ্ধাও জাগে। অতঃপর চাং-এর আঁকা ছবিও তাকে বিস্মিত করে।

এই ছবির প্রসঙ্গ নিয়ে এরপরে আলোচনা চলে। এখানে চিত্রকলা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই অংশের নাম 'আলাপ'। সেখানেই স্পেনীয় সংগীত সম্পর্কে আছে দীর্ঘ বাক্যালাপ।

এখান থেকে আমরা দিলীপকুমার রায়ের ‘দোলা’ উপন্যাসের অভিপ্রেত নকশাটি বুঝতে পারি। তিনি উপন্যাসের আধারে ইউরোপের কবিতা, চিত্রকলা, নৃত্য এবং সংগীতের বিভিন্ন দিককে যেমন নিজে অনুভব করেছেন, তেমনই পাঠককেও অনুভব করাতে চেয়েছেন।

আয়তনের দিক থেকে ‘দোলা’ একটি বৃহৎ পরিসরের উপন্যাস। এর ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকেও সেই বিশালতা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসটির মূল বিষয় ভারতীয় যুবক স্বপনের সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি রমণীদের সংস্পর্শ লাভ। পুরো উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বিদেশের পটভূমিতে। বিশেষ করে ফ্রান্স-এর পটভূমিই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। স্বপন ও আনা-র মূল সম্পর্কের পাশাপাশি স্বপন-ইসাবেলা, চাং-ইসাবেলা, চাং-মারিয়ানা, বার্টন-ইসাবেলা, ভালের-জুলিয়া, মসিয়ে বেনার-সারা, মসিয়ে বেনার-জুলিয়া ইত্যাদি নানা রকম উপাখ্যানের ভারে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত।

‘দোলা’ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, এই উপন্যাসটি সম্পর্কে একটি কথা তার বলার আছে — “কেননা দোলা পড়ে সে যুগে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, এর নায়ক স্বপনের মধ্যে দিলীপকুমার-ই রয়েছেন লুকিয়ে। একথা সত্য নয়। স্বপনের অনেক চিন্তা, কার্য, আশা-আকাঙ্ক্ষাই তার নিজের — দিলীপকুমারের নয়···।”[৫]

তা সত্ত্বেও ‘দোলা’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক চেয়েছেন মানবহৃদয়ের নানামুখী সত্যসন্ধানকে তুলে ধরতে চিন্তায়, তর্কে, চরিত্র-চিত্রণে, বিশ্লেষণে, বেদনায়, স্বপ্ন গড়ার আনন্দে, স্বপ্ন ভাঙার ব্যথায়। তাই যে সমস্ত পাঠক এই উপন্যাসের মধ্যে শুধুই গল্প খুঁজবেন, সত্য সন্ধানকে যাঁরা অনৌপন্যাসিক মনে করবেন, লেখক বলেছেন ‘দোলা’ তাদের পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। কারণ উপন্যাসে তিনি এমন অনেক কিছুই প্রকাশ করতে চান যার সঙ্গে গল্পের অহি-নকুল সম্পর্ক বলে অনেকেই মনে করেন। কেননা এইটিই তার আসল, গল্প গৌণবস্তু।

‘দোলা’ উপন্যাসের পরিসমাপ্তিকে বলা যায় অনেকটা প্রতীকী। অংশটির নাম ‘স্বপ্নভঙ্গ’। স্বপন একটি স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্ন-বিবরণ লেখকের ভাষাতেই তুলে দেওয়া হল — “আনা যেন কী একটা ঘোমটায় মুখ ঢেকে চলেছে। স্বপন তাকে ঘোমটা খুলতে বলে — ও খোলে না। হঠাৎ সন্ধ্যা এসে কোথা থেকে টপ করে খুলে দিল। দেখে চমকে ওঠে স্বপন! এ মুখ··· আনার তো নয়··· খানিকটা সন্ধ্যার, আর খানিকটা যেন কার? মনে পড়ে··· পড়ে··· পড়ে না··· ওই পড়েছে — ইসা — ইসাবেলার না? স্বপন শুধোয় : ‘এ কে তুমি?’

মূর্তি বলে, ‘চিনতে পারছো না — যুগে যুগে আমাকেই খুঁজেছ — একজনকেই — নানা নারীর মধ্যে দিয়ে তুমিও, চাঙও, মসিয়েও — !” (স্বপ্নভঙ্গ, দোলা)

বিদেশ, মূলত ইউরোপের পটভূমিতে আরও উপন্যাস লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়। সেগুলির নাম আমরা নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি। প্রধান দুটি উপন্যাসকে সামনে রেখে ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক দিলীপকুমার রায়ের বিদেশের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করে এই নিবন্ধ শেষ করলাম।

প্রথমেই দেখা যায়, উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়ের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অস্তিত্ব কোথাও নেই। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যে বহু বিখ্যাত উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যেও উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস লিখেছেন। বিশ শতকে ১৯২০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’, ‘গোরা’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘চার অধ্যায়’-এর মতো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত প্লট-এর আধারে রচিত হয়েছে উপন্যাস। কিন্তু সেসবের কোনও প্রভাব পড়েনি দিলীপকুমারের লেখায়। তিনি কয়েকজন মানব ও মানবীর চরিত্র ভেবে নিয়েছেন। তারপর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের মনের গতির বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপন্যাসের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। অতএব দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসকে গ্রহণ করতে হবে চরিত্রগুলির ভাবলোকের বিচিত্র পরিসরকে তুলে ধরার অভিপ্রায়ের মধ্যে। তাঁর উপন্যাসগুলি যতটা মানুষের ভাবজগতের, ততটা বাস্তবজীবনের উপন্যাস নয়।

এই নিবন্ধে আমরা ঔপন্যাসিকের চোখে ইউরোপের জীবন অভিজ্ঞতা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই দিকগুলির দিকে দৃষ্টি দেব।

আমরা দেখতে পাই যে, তিনি যেসব স্থানে বসবাস করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। ইংল্যান্ড-এর লন্ডন ছাড়াও ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের ঘর-বাড়ি, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব ইত্যাদির বর্ণনা এমনভাবে দিয়েছেন যে সেসব স্থান চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এরপরে আসে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ। দিলীপকুমারের দৃষ্টি ছিল সৌন্দর্যমুগ্ধ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনাতেও ছিল তাঁর আনন্দ। উপন্যাসগুলিতে লেক্, সমুদ্রতীর, পর্বতের সানুদেশ, অরণ্য, উদ্যান ইত্যাদির মনোরম বর্ণনা আছে। পাঠককে তা ইউরোপের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাদ দেয়।

সেই সঙ্গে তিনি ইউরোপের চিত্রশালা, জাদুঘর, বিভিন্ন অট্টালিকা, নাট্যশালা, সংগীতানুষ্ঠান ইত্যাদিরও অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

সবচেয়ে বড়ো কথা, বিশ শতকের প্রথমার্ধেই পাশ্চাত্য দেশের নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে মুক্ততা ছিল, তার সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অনেক পার্থক্য। সেই দিকটি তাঁর উপন্যাসে খোলাখুলিভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেই সম্পর্কের চিন্তন এবং উপলব্ধির বিস্তার ও মাধুর্যকেই তিনি তুলে ধরেছেন; শারীরিক বর্ণনার প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ দেখা যায় না।

সব শেষে বলা যায়, তাঁর উপন্যাসে ঘটনা-সংস্থানের সংগতির দিকটি উপেক্ষিত, কিন্তু মানুষের দার্শনিক উপলব্ধিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিক চেতনা, প্রেমচেতনা, ঈশ্বরীয় উপলব্ধি — প্রভৃতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইউরোপবাসীর সঙ্গে ভারতীয় মানসিকতার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ইউরোপে

ভারতীয় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে ইউরোপের মানুষের, বিশেষভাবে তরুণ-তরুণীদের চরিত্রকে পাশাপাশি রেখে এবং তাদের মধ্যে মনের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে তিনি এমন এক আন্তর্জাতিকতায় বাংলা উপন্যাসকে স্থাপন করেছেন যা সেই সময়ে ছিল খুবই ব্যতিক্রমী।

উল্লেখসূত্র :

1. দিলীপকুমার রায়ের এই জীবনতথ্য যেসব উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি হল — রায় দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের ভূমিকা এবং দিলীপকুমার রায় সংকলনগ্রন্থ, সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৭
2. রায় দিলীপকুমার, রঙের পরশ, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ২২ ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
3. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের মাত্রা, সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
4. রায় দিলীপকুমার, উৎসর্গ পত্র, দোলা (প্রথম ভাগ), ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
5. প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, চার-এর অনুরূপ